সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী—মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল ‘সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং’। বেণ-রাজার ন্যায় তিনি সর্ব-দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত

হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান্, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গে ‘থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,’ যাহার হস্তধৃত সুবর্ণভাণ্ডরূপ বকাণ্ড-প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, ‘আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে’—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, ‘আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ’। কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, “উন্মাদ! ‘অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’ তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি-ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।”

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকারে বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকার সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ-কশাহস্ত বণিক—সকলের হৃৎকম্প-উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য-সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

‘বণিক কোন্ দেশে না যায়?’ নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলা-বিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনী-যোগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্য-প্রাদুর্ভাব না হইলে আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্য-ভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়দের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতেতর দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজ, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়, ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারণে' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎসর্গ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য

জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালীর ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময়ে আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্[২৬] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র-পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিস্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর[২৮] ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। সে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানীর এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূতির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ড ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-

প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা–যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?